মডেল টেস্ট-এর উত্তরমালা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

মডেল টেস্ট- ০১

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	K	৩	N	৪	L	৫	L	৬	K	৭	L	৮	L	৯	L	১০	L	১১	K	১২	K	১৩	L	১৪	N	১৫	N
	১৬	N	১৭	M	১৮	M	১৯	M	২০	L	২১	N	২২	L	২৩	N	২৪	N	২৫	K	২৬	K	২৭	N	২৮	K	২৯	K	৩০	K

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ৪টি দল নিয়ে গঠিত ঐক্যজোটই হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট।

খ ছয় দফা দাবিতে বাঙালির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির কথা উল্লেখ থাকায় একে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

১৯৬৬ সালে ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ছয় দফা দাবি ছিল প্রথম জোর প্রতিবাদ। এতে বাঙালির তীব্র প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি তুলে ধরা হয়। এতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও এ কর্মসূচি বাঙালিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। আর এ কারণেই ৬ দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

গ ঘটনা-১ এ উল্লিখিত ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি জাতির স্বতন্ত্র অধিকারের দাবির প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। কয়েক বছর ধরে চলা ভাষা আন্দোলন চরমে ওঠে ১৯৫২ সালে। এ বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন। এতে রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ আরও অনেকে শহিদ হয়।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ বর্ণিত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলে সেখানে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। এ ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বস্তুত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে ভাষা আন্দোলন ছিল সর্বপ্রথম ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি সর্বপ্রথম নিজেদের সতন্ত্র সত্তা ও অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়। পূর্ব বাংলায় স্বাধিকারের চিন্তা চেতনার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর এ চেতনাই পরবর্তীকালে প্রতিটি গণআন্দোলনে প্রেরণা জোগায় এবং বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে। বাঙালি হিসেবে তারা নিজেদের আত্মপরিচয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে, যা পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ ঘটনা-২ এ উল্লিখিত ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে আমি মনে করি।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। এ বৈষম্যের প্রতিবাদ এবং বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা উত্থাপন করেন। পাকিস্তানি শাসকেরা এ দাবিকে মেনে নেয়নি। তাদের অব্যাহত দমন নিপীড়ন বাঙালিকে আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। যার ফলস্বরূপ সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে ১৯৬৯ সালে একটি গুরুত্বর্পূণ আন্দোলন সংঘটিত হয়। যা ইতিহাসে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এ আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা শহিদ হন।

ঘটনা-২ এ বর্ণিত আন্দোলনেও একজন ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক শহিদ হন, যা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানকেই ইঙ্গিত করে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশে স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। স্বাধিকার আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সাফল্য ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ রাজবন্দিদের মুক্তিলাভ। তাছাড়া এ আন্দোলনের ফলে লৌহমানব খ্যাত সামরিক শাসক আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। তার পদত্যাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য আরো সুদৃঢ় হয়। এ পর্যায়ে তারা চূড়ান্ত লক্ষ্যার্জনের পথে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যাপক গণরায় প্রদানের মাধ্যমে এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় এবং তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করে। যার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি বাহিনী যে গণহত্যা চালায়, তাই অপারেশন সার্চলাইট।

খ মুক্তিযুদ্ধে বাংলার সর্বস্তরের বাঙালি অংশগ্রহণ করেছিল বলে একে গণযুদ্ধ বলা হয়।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেবাবাহিনী আক্রমণ চালালে বাঙালি ছাত্র, জনতা, পুলিশ, ইপিআর সাহসিকতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলে। বিভিন্ন পেশাজীবী, নারী, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সর্বস্তরে জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। তাই এ যুদ্ধকে 'গণযুদ্ধ' বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনার মিল রয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের নিরীহ বাঙালির ওপর 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক পরিকল্পনার মাধ্যমে নৃশংস গণহত্যা শুরু করে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এতে দেশের সর্বস্তরের জনগণ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

উদ্দীপকের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, 'X' দেশের সর্বস্তরের জনগণ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেন। দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে তাদের বুকের তাজা রক্ত দিতে হয়েছে। উদ্দীপকের 'X' দেশের এই ঘটনা বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনাকেই নির্দেশ করে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ দেন। উদ্দীপকে এ ঘটনারই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ 'উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জনগণের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার দলিল'– উক্তিটি যথার্থ।

সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে তা কার্যকর হয়। গণপরিষদে সংবিধানের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।"

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'X' দেশটি দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়। এরপর দেশটিকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে একটি সংবিধান রচনা করা হয়, যা বাংলাদেশের সংবিধানকেই নির্দেশ করছে। বাংলাদেশের সংবিধান হলো এর সর্বোচ্চ দলিল। এ দলিলে এদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত। এতে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এ ৪টি বিষয়কে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানে সাধারণত মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ সংবিধানে জীবনধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাক্ স্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়। সংবিধানে বাংলাদেশকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এতে আরও ঘোষণা করা হয়েছে, বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এর মাধ্যমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। আর এই অধিকারগুলোর রক্ষার জন্য এদেশের মানুষ দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত বাংলাদেশের সংবিধান জনগণের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্যের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কালো দাগ দেখা যায় তাকে সৌরকলঙ্ক বলে।

খ ভূ-পৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত কোনো বিন্দুর বিপরীত বিন্দুকে সেই বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান বলা হয়।

প্রতিপাদ স্থান সম্পূর্ণভাবে একে অন্যের বিপরীত দিকে থাকে। এ স্থান নির্ণয় করার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের কোনো বিন্দু থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে একটি কল্পিত রেখা পৃথিবীর ঠিক বিপরীত দিকে টানা হয়। ঐ কল্পিত রেখা যে বিন্দুতে ভূ-পৃষ্ঠের বিপরীত পাশে এসে পৌছায় সেই বিন্দুই পূর্ববর্তী বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান।

গ উদ্দীপকের শামীমের শহরটির অবস্থান ১৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমা এবং তার বন্ধু সোহেলের শহরটির অবস্থান ১১০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত।

শামীম ও সোহেলের শহরের দ্রাঘিমার পার্থক্য = (১৭০° + ১১০°)
= ২৮০°.

আমরা জানি,

১° দ্রাঘিমার জন্য সময় পার্থক্য ৪ মিনিট

∴ ২৮০° " " " " (২৮০ × ৪) মিনিট
= ১১২০ মিনিট
= ১৮ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

উদ্দীপকে উল্লিখিত শামীমের শহরের অবস্থান পশ্চিম এবং তার বন্ধু সোহেলের শহরের অবস্থান পূর্বে হওয়ায় সোহেলের শহরের সময় শামীমের শহরের চেয়ে বেশি হবে। অর্থাৎ, সোহেলের শহরের সময় শামীমের শহরের চেয়ে ১৮ ঘণ্টা ৪০ মিনিট বেশি হবে।

ঘ হ্যাঁ, শামীমের শহর থেকে সোহেলের শহরে সরাসরি যেতে হলে সময় ও তারিখের পরিবর্তন হবে।

উদ্দীপকে শামীমের শহরের অবস্থান ১৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমায় এবং সোহেলের শহরের অবস্থান ১১০° পূর্ব দ্রাঘিমায়।

∴ দুটি শহরের দ্রাঘিমার পার্থক্য = (১৭০° + ১১০°) = ২৮০°

আমরা জানি,

১° দ্রাঘিমা পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।

∴ শহর দুটির সময়ের পার্থক্য = (২৮০ × ৪) = ১১২০ মিনিট
= ১৮ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

অর্থাৎ, শহর দুটির সময়ের পার্থক্য হবে ১৮ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। আবার, সোহেলের শহরের অবস্থান শামীমের শহরের পূর্বে হওয়ায় সোহেলের শহরের সময় বেশি হবে।

সুতরাং, সোহেলের শহরের সময় শামীমের শহর থেকে ১৮ ঘণ্টা ৪০ মিনিট বেশি হবে।

এখন শহর দুটি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার বিপরীত দিকে অবস্থিত হওয়ায় দুটি স্থানের তারিখ একদিন কম-বেশি হবে। সোহেলের শহর শামীমের শহরের পূর্বে অবস্থিত হওয়ায় সোহেলের শহরের তারিখে একদিন বেশি যোগ করতে হবে। অর্থাৎ, শামীমের শহরের তারিখ যদি হয় ১ জানুয়ারি, তবে সোহেলের শহরের তারিখ হবে ২ জানুয়ারি।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানির পরিকল্পিত প্রাপ্যতা ও ব্যবহারকে পানি ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

খ নদীতে পলি জমা, অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ দেয়া ও সেতু নির্মাণ প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে নদী প্রবাহ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীগুলোই যেন বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অথচ দখল, বিষাক্ত শিল্পবর্জ্যের দূষণ, অপরিকল্পিত বাঁধ ও পলি জমার কারণে বর্তমানে দেশের বহু নদী মৃতপ্রায়। এছাড়া উজান থেকে বয়ে আসা পানিতে প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি থাকে যা ধীরে ধীরে

নদীর তলায় জমতে থাকে। এতে নদীর গভীরতা হ্রাস পায়। ফলে নদীর পানি প্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া নিয়ম-নীতি না মেনে নদীর উপর যত্রতত্র সেতু, কালভার্ট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের ফলেও নদীর পানি প্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

গ উল্লিখিত চিত্রে 'C' চিহ্নিত স্থান দ্বারা ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমিকে নির্দেশ করে।

জলবায়ু ও মাটির ভিন্নতার কারণে এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশে তিন ধরনের বনাঞ্চল লক্ষ করা যায়। যেমন– ১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল, ২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল এবং ৩. স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি।

উদ্দীপকে উল্লেখিত মানচিত্রের 'C' চিহ্নিত অঞ্চলের বনভূমি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, দিনাজপুর ও রংপুর এলাকার পাতাঝরা বনের অঞ্চলকে নির্দেশ করে। এ বনভূমিতে বছরের শীতকালে একবার গাছের পাতা সম্পূর্ণরূপে ঝরে যায়। এ বনে শাল (স্থানীয় নাম গজারি) বেশি জন্মায় বলে একে শানবনও বলা হয়। এছাড়া এ অঞ্চলে কড়ই, বহেড়া, হিজল, শিরীষ, হরীতকী, কাঁঠাল, নিম প্রভৃতি গাছ জন্মে। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুরে এ বনভূমি মধুপুর ভাওয়াল বনভূমি নামে পরিচিত। দিনাজপুর অঞ্চলের বনকে বরেন্দ্র বনভূমি বলা হয়। বাংলাদেশের বনভূমির উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে এই ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমি, যা মানচিত্রে 'C' চিহ্নিত স্থানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের মানচিত্রে 'A' ও 'B' চিহ্নিত বনভূমি দুটি হলো ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল এবং স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বনভূমি। আমি মনে করি, এদের মধ্যে স্রোতজ বনভূমি অর্থাৎ 'B' বনভূমি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিক অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও সিলেট অঞ্চলের প্রায় ১৪ হাজার বর্গ কি. মি. এলাকা জুড়ে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা গাছের বনভূমি গড়ে উঠেছে। বাঁশ, বেত, চাপালিশ, ময়না, তেলসুর, মেহগনি, জারুল, সেগুন, গর্জন এ বনভূমির উল্লেখযোগ্য গাছ। রাবার চাষ হয় এ অঞ্চলে। স্থানীয় বাঁশ ও বেতকে ব্যবহার করে চট্টগ্রামে কাগজ শিল্পের প্রসার ঘটেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প।

অন্যদিকে বাংলাদেশে মোট ৪,১৯২ বর্গ কিলোমিটার স্রোতজ বা গরান বনভূমি রয়েছে। স্যাঁতসেঁতে লোনা পানিতে সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বাইন, গরান, গোলপাতা ইত্যাদি বৃক্ষ এ বনভূমির অন্তর্গত। সরকার প্রতি বছর স্রোতজ বা গরান বনাঞ্চল থেকে বহু টাকার রাজস্ব আয় করে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনে বিপুল বনজ সম্পদ রয়েছে। বর্তমানে এই বনের ১৭টি খাত থেকে সরকার বছরে প্রায় ৭ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করছে। এসব খাতের মধ্যে রয়েছে মাছ ধরা, মধু সংগ্রহ, কাঁকড়া ধরা, জ্বালানিকাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজের জন্য লাইসেন্স। সুন্দরবনের বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে বেশ কিছু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে আছে খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল ও হার্ডবোর্ড মিল-কারখানা। এই দুটি কারখানারই কাঁচামাল যথাক্রমে সুন্দরবনের গেওয়া ও সুন্দরী গাছ। এ বনাঞ্চল দেশের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। আর অর্থনীতিতে এ খাতটির অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, সরকারের রাজস্ব আয়, অসংখ্য মানুষের জীবিকার সংস্থান, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ প্রশমন, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং পর্যটন শিল্পে অবদানের মাধ্যমে সুন্দরবন তথা স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বনভূমি ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমির চেয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিক অবদান রাখছে।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকে নাগরিক বলে।

খ সুশাসনের জন্য আইন গুরুত্বপূর্ণ কারণ, আইনের অনুশাসন ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে কেউ আইন অমান্য করে অন্যের অধিকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। কেউ কারও অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে না। তাই সুশাসনের জন্য আইন অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।

গ ঘটনা-১ এর কমিটির সাথে রাষ্ট্রের সরকার উপাদানের মিল আছে।

রাষ্ট্রের অপরিহার্য তৃতীয় উপাদানটি হলো সরকার। সরকার গঠনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনটি বিভাগ থাকে– আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। এ তিন বিভাগের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের সরকার গঠন করে। আর সরকার জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ গঠিত কমিটিও জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেয়। যা রাষ্ট্র গঠনে সরকার উপাদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সরকার পদ্ধতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন হতে পারে। সরকার বলতে ব্যাপক অর্থে শাসকগোষ্ঠীর সকলকে বোঝায়, যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের কমিটির সাথে রাষ্ট্রের সরকার নামক উপাদানের মিল রয়েছে।

ঘ রাকিবের ক্লাবের কাজের সাথে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি সাদৃশ্যপূর্ণ। আর রাষ্ট্রের উন্নয়নে এ ধরনের কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজের অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্র নানা ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। মানবজীবনের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের কাজ। আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন– অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি এবং কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি। উদ্দীপকে রাকিবরা ক্লাবের মাধ্যমে যেসব কাজ করে তা রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজের অনুরূপ।

রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বৈষম্য ও কুসংস্কার দূর করা, বাল্যবিবাহ রোধ এবং জেন্ডার সমতা বিধান প্রভৃতি। বর্তমানে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের দাবি করে। রাজনৈতিক তত্ত্ববিদরা এখন একমত যে, রাষ্ট্রের ভূমিকা শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং কর আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্রকে আবশ্যই সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য, নাগরিকদের নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে কল্যাণমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে।

জনকল্যাণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের এ কাজগুলো ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজ। যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে যতবেশি উন্নত তার ঐচ্ছিক কার্যাবলি ততবেশি বিস্তৃত। তাই রাষ্ট্রের উন্নয়নে কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলির গুরুত্ব অপরিসীম।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার অধিভুক্ত বিভাগসমূহের অফিসগুলোকে যৌথভাবে সচিবালয় বলে।

খ রাষ্ট্র যেমন নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার প্রদান করে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকদের কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। অধিকার ভোগের পাশাপাশি আমাদেরকে রাষ্ট্রের উন্নয়নে নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। তা না হলে রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে নাগরিকদের অধিকারসমূহ দিতে পারে না। অর্থাৎ অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর নির্ভরশীল ও পরিপূরক। একটির অবিদ্যমানতায় অন্যটি অস্তিত্বহীন। আর এ কারণেই আমরা আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হব।

গ জনাব রাসেলের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ করছে।

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারপ্রধান। তিনি প্রশাসনিক নির্বাহী কর্মকর্তা। সংসদীয় ব্যবস্থায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা শীর্ষ পর্যায়ে। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে শাসনক্ষমতা পরিচালিত ও আবর্তিত হয়। তিনি অত্যন্ত সম্মানজনক পদমর্যাদার অধিকারী। তিনি পুরো শাসনব্যবস্থার কার্যকর নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব রাসেল রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন এবং পরামর্শ দেন, যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রমের সদৃশ। শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম কাজ হলো রাষ্ট্রীয় কাজে সমন্বয় সাধন করা। প্রধানমন্ত্রী যেহেতু প্রশাসনের কেন্দ্রে অবস্থিত তাই সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও অধিদপ্তরের কাজের মধ্যে তিনিই সমন্বয় সাধন করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। তাই বলা যায়, জনাব রাসেলের কার্যক্রম রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ করছে।

ঘ জনাব আরমান সাহেব বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান উপজেলা পরিষদের প্রধান।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো উপজেলা পরিষদ। দেশের উপজেলাসমূহে স্থানীয় জনগণের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলার জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন।

উদ্দীপকের জনাব আরমানও উপজেলা শহরে বসবাসকারী জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং এলাকার প্রধান ব্যক্তি হিসেবে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ জনাব আরমান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান উপজেলা পরিষদের প্রধান। তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান নামে অভিহিত হন। বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে উপজেলা পরিষদের প্রধান হিসেবে জনাব আরমান সাহেবের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলা পরিষদের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে তিনি উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করেন। এলাকার প্রধান হিসেবে তিনি যোগাযোগ, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদির উন্নয়নে কঠোর পরিশ্রম করেন। তিনি এলাকার সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার জন্যও কাজ করছেন। জনাব আরমানের এমন কার্যক্রম স্থানীয় এলাকাবাসীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটাবে তাতে সন্দেহ নেই।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে জনাব আরমান সাহেবের কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত সাধারণ পরিষদকে বিতর্ক সভা বলে।

খ নির্বাচনের সকল ভোটারকে একত্রভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

নির্বাচন হচ্ছে জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতি। স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সকল নাগরিক ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি বাছাই করে। যারা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা অর্থাৎ ভোটদানের অধিকার ভোগ করেন তাদেরকে ভোটার বা নির্বাচক বলে। আর সকল ভোটারকে একত্রিতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি জাতিসংঘকে নির্দেশ করছে।

বিশ শতকের ইতিহাসে পৃথিবী জুড়ে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও ধ্বংসলীলা মানুষকে যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং শান্তির জন্য আগ্রহী করে তোলে। তাই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গঠন করা হয় লীগ অব নেশনস। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধের বিভীষিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ ছিল। এর ভয়াবহতা বিশ্ব বিবেককে ভীষণভাবে নাড়া দেয় ও আতঙ্কিত করে তোলে। বিশ্বনেতারা হতভম্ব হয়ে পড়েন। তাই যুদ্ধ অবসানে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো একজোট হয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ গঠন করে। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকে সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং মানবজাতির উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্বনেতারা হতভম্ব হয়ে পড়েন। তারা যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী উন্নতি, শান্তি, প্রগতি ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই সংস্থাটি উপরে বর্ণিত জাতিসংঘের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থা তথা জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ। আর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। স্বভাবতই জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রায় ১১,০০০ এর বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। সিয়েরালিওনে বাংলা ভাষা পেয়েছে সেই দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। আইভরিকোস্টে অন্যতম ব্যস্ত সড়কের নাম হয়েছে 'বাংলাদেশ সড়ক'। শান্তি মিশনে শুধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নয়, পাশাপাশি পুলিশ বাহিনী ও মহিলা পুলিশও নিয়োজিত আছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতিসংঘে তথা বিশ্বে বাংলাদেশ পেয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও বিশেষ মর্যাদা। এ কাজে এখন পর্যন্ত ১৩৪ জন বাংলাদেশি সৈন্য বিশ্বশান্তির জন্য শহিদ হয়েছেন। আহত হয়েছে অনেক।

এভাবে বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন দেখছি।

খ সুষম আর্থসামাজিক উন্নয়ন টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এজন্য বৈষম্য হ্রাসকরণ অত্যন্ত জরুরি।

সমাজের নারী-পুরুষ মানবসভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের অবদানেই বিশ্ব আজ এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমাদের সমাজে নারী পুরুষে বৈষম্য প্রকট। সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বিদ্যমান। শুধু নারী-পুরুষ বৈষম্য নয়, রয়েছে ধন বৈষম্য। ধনী-গরিব বৈষম্যের উপস্থিতিও সমাজের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই এসডিজি অর্জনে এ সকল বৈষম্য হ্রাস করা অত্যন্ত জরুরি। বৈষম্যের বিলুপ্তি ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হবে। এজন্য এসডিজি অর্জনে সকল ধরনের বৈষম্য কমিয়ে আনা জরুরি।

গ এসডিজি অর্জনে ঘটনা-১ এর রহিম শেখ অংশীদারিত্বের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়নি।

জাতিসংঘ নির্ধারিত ১৭টি অভীষ্টের সমষ্টি হলো এসডিজি। এর প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাপী টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। আর এ লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সকলের অংশগ্রহণ তথা অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এসডিজি অর্জনে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ শিল্পপতি রহিম শেখ একটি ট্যানারি শিল্প স্থাপন করলেও তিনি তার পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেননি। ফলে তা পার্শ্ববর্তী নদীতে গিয়ে নদী দূষণ ঘটায়। এর প্রতিবাদ করলেও তিনি ক্ষমতার জোরে আর নিজ স্বার্থরক্ষায় কোনো পদক্ষেপ নেননি। তার এধরনের কর্মকাণ্ড পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে আনবে। তিনি ব্যক্তিস্বার্থে বৃহৎস্বার্থকে উপেক্ষা করেছেন। এসডিজির প্রেক্ষিতে তিনি টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্বের অংশীজন হতে পারেননি। তিনি অংশীদারিত্বের গুরুত্বকে অস্বীকার করেছেন। তার এ ধরনের কর্মকাণ্ড এসডিজি বাস্তবায়নে তথা লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে।

ঘ উন্নয়নে সম্মিলিত অংশগ্রহণ না থাকায় 'ঘটনা-২ হলো ঘটনা-১ এর ফসল'– এসডিজি অর্জনের প্রেক্ষাপটে মন্তব্যটি যথার্থ।

এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কেবল ব্যক্তিক লাভের কথা চিন্তা না করে সামষ্টিক লাভের কথা চিন্তা করা। যেকোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হোক না কেন তা যেন সকলের কথা ভেবে করা হয়। যার যতটুকু দায়িত্ব তা স্ব স্ব অবস্থানে থেকেই পালন করতে হবে। এতে করে এসডিজির লক্ষ্য অর্জন করা সহজতর হবে। অন্যথায় তা কেবল উন্নয়নই হবে কিন্তু টেকসই হবে না।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ অংশীদারিত্বের কথা বিবেচনা না করে রহিম শেখ ক্ষমতার জোরে পরিবেশের ক্ষতি করেছে। এ ধরনের ঘটনা আমাদের দেশের একটি সাধারণ চিত্র। সকলে নিজের উন্নয়ন, নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অন্যের লাভক্ষতির কথা কিংবা তার কাজের পরিণাম নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। ফলশ্রুতিতে ঘটনা-২ এর দেখা মিলে সর্বত্র। পরিবেশ দূষণের ফলে উদ্দীপকের ফরিদ মিয়ার মতো অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসে। প্রভাবশালীদের ব্যক্তিক লাভের বলি হয় অনেক সাধারণ জনগণ, বলি হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ। একারণেই এসডিজি অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সকলের অংশগ্রহণই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রাথমিক হাতিয়ার।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, এসডিজি অর্জন এখন বিশ্বব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়, সরকার থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সর্বক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য; যদি বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হয়। অন্যথায় তা প্রতিক্ষেত্রে উদ্দীপকের ঘটনা-২ এর কারণ হয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করবে।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ শোষণহীন উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে যে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণি শোষিত হয় না সেই উৎপাদন ব্যবস্থাকে বোঝায়।

শোষণহীন উৎপাদন ব্যবস্থা হলো একটি সামাজিক কল্যাণমুখী প্রক্রিয়া। এ উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করা হয় বলে তারা শোষিত হয় না। এর ফলে উৎপাদিত সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব।

গ উদ্দীপকের 'X' দেশটিতে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি বা বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো পণ্য উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং ভোগ করে। অর্থাৎ এখানে উৎপাদক ও ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এ ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে হলো, এতে বক্তি বা উৎপাদনকারী বিনিয়োগ ও উৎপাদন করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। সম্ভাব্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যক্তি বা বিনিয়োগকারী শ্রমিককে ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে শ্রমিকরা শোষিত হয় এবং সম্পদ ও আয় বণ্টনে অসমতা দেখা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'X' দেশটির অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সর্বাধিক মুনাফা অর্জন এবং বণ্টনে অসমতা। 'X' দেশটির অর্থব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যগুলো উপরে বর্ণিত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, 'X' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে 'Y' এবং 'Z' দেশ দুটির অর্থব্যবস্থা হলো সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থব্যবস্থা। উক্ত দুটি অর্থব্যবস্থার মধ্যে 'Z' দেশের মিশ্র অর্থব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর বলে আমি মনে করি।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ফলে এখানে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন হয়। আর মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থায় আয় বৈষম্য দেখা দেয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া ভোক্তার নিজের ইচ্ছামতো দ্রব্যসামগ্রী ভোগের সুযোগ নেই। অন্যদিকে, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্যোক্তা যেকোনো দ্রব্য যেকোনো পরিমাণে উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা লাভ করে। এ ব্যবস্থায় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন অংশে সামাজিক কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি পায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ ও ভোগের স্বাধীনতা না থাকায় উৎপাদন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রণোদনা ও উদ্যম হ্রাস পায়। কর্মে নিয়োজিত শ্রমিকরাও দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে না। এতে সম্পদের কাম্য ব্যবহার বিশেষত ব্যক্তির সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা ও সৃজনশীলতা নিশ্চিত করা যায় না। অন্যদিকে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও ভোগের স্বাধীনতা থাকায় উৎপাদন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রণোদনা ও উদ্যম বৃদ্ধি পায়। এতে ব্যক্তির সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য জনকল্যাণের পাশাপাশি জনগণের উৎপাদনশীলতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। তাই এদেশের জাতীয় উৎপাদন ও অগ্রগতির জন্য 'Z' দেশে প্রচলিত মিশ্র অর্থব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাই বাণিজ্য শুল্ক।

খ সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়কর প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসন পরিচালনা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। এ ব্যয়

নির্বাহের জন্য সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে কর সংগ্রহ করে, যার অন্যতম হলো আয়কর। জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয়ের ওপর এ কর ধার্য করা হয়। যাদের আয় একটি নির্দিষ্ট সীমার ঊর্ধ্বে তাদের নিকট হতে প্রগতিশীল হারে আয়কর আদায় করা হয়। আর সরকারের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্যই জনগণ আয়কর দিয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Y' প্রতিষ্ঠানটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সকল ব্যাংকের ব্যাংক। এটি দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। এটি সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনায় সাহায্য করাসহ বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব রাজু 'Y' নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। প্রতিষ্ঠানটি সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এবং তথ্যের আলোকে উন্নয়নমূলক গবেষণায় সহায়তা করে। 'Y' প্রতিষ্ঠানের কাজগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ কাজগুলো ছাড়াও আরও বহুবিদ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। দেশের কাগজি মুদ্রার প্রচলন ও মুদ্রাব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মুদ্রাই দেশের 'বিহিত মুদ্রা'। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক হিসাব-নিকাশ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এই ব্যাংক সুদ ছাড়া সরকারের অর্থ জমা রাখে, প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ এবং আর্থিক ব্যাপারে পরামর্শ দান করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মেটাতে ক্লিয়ারিং হাউজ বা 'নিকাশ ঘর' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য দেশের মুদ্রার সাথে দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার নির্ধারণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে। উপর্যুক্ত কাজ ব্যতীত কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও কতকগুলো কাজ সম্পন্ন করে থাকে, যেমন— নিজ দেশে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা, স্বর্ণ, রৌপ্য মূল্যবান ধাতু ও উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করা প্রভৃতি।

ঘ 'Z' হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

যে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে চাহিদা পূরণের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলির একটি হলো নিরাপদে ও দ্রুত টাকা স্থানান্তর করা। এ ধরনের ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ভ্রমণকারীর চেক, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (টিটি) ইত্যাদি উপায়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে দ্রুত অর্থ প্রেরণে জনগণকে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের জনাব রাজু তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলের কাছে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুত টাকা পাঠান, যা বাণিজ্যিক ব্যাংককেই নির্দেশ করে। আর এদেশের অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার তথা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন বিনিয়োগ জরুরি। এজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবদান রাখে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমেই বৈদেশিক বাণিজ্যের আর্থিক লেনদেনের অধিকাংশ কাজ পরিচালিত হয়। এছাড়া এসব ব্যাংক ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, আমদানি, রপ্তানিকারককে ঋণ প্রদান, বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। দেশের দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কৃষি ও পল্লিঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের বাড়িভাড়া, আয়কর, বিমার প্রিমিয়াম, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল প্রভৃতি পরিশোধ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের 'Z' আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক এদেশের অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজ কাঠামো ও এর কার্যাবলির পরিবর্তন।

খ নারীর ক্ষমতায়ন বলতে সমাজ বা রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়।

সমাজ বা রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা কিংবা সুযোগ সৃষ্টি করে নেওয়াই হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। একসময় নারীরা সর্বক্ষেত্রেই অবহেলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তারা শিক্ষাদীক্ষায় সচেতন হয়েছে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে।

গ তাহসিনের পরিবারকে একই সঙ্গে একক পরিবার ও নয়াবাস পরিবার বলা যায়।

আকারের ভিত্তিতে পরিবার তিন ধরনের। যেমন— একক বা অণু পরিবার, যৌথ পরিবার এবং বর্ধিত পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তানসন্ততি নিয়ে গঠিত পরিবারকে একক পরিবার বলা হয়। এ পরিবার দুই পুরুষে আবদ্ধ। দুই পুরুষ হলো পিতা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানসন্ততি। এ ধরনের পরিবার আকারে ছোটো হয়। আবার বিবাহিত দম্পতি স্বামী বা স্ত্রী কারও পিতার বাড়িতে না বাস করে পৃথক বাড়িতে বাস করলে তাকে নয়াবাস পরিবার বলা হয়। শহরে চাকরিজীবীদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তাহসিনের পরিবারে কেবল তার বাবা-মা আছে, যা একক পরিবারের বৈশিষ্ট্য। আবার তাহমিদের চাকরিজীবী বাবা-মা নিজেদের কারো পিতার বাড়িতে বসবাস না করে শহরে আলাদাভাবে বাস করে। আর এ ধরনের পরিবারকে বলে নয়াবাস পরিবার। অতএব বলা যায়, তাহসিনের পরিবারটি হলো একক ও নয়াবাস পরিবার।

ঘ তাহসিনের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের শেষাংশে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম।

বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট সংবাদ, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিষয়বস্তু, বিশেষ ধ্যানধারণা, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করে গণমাধ্যম। গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি।

উদ্দীপকের শেষাংশে বলা হয়েছে তাহমিদ পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে পত্রিকা পড়ে এবং টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ও নাটক দেখে। আর এগুলো সামাজিকীকরণের অন্যতম উপকরণ গণমাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত। গণমাধ্যমে বিশেষ করে সংবাদপত্রে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর সংবাদ প্রকাশিত হয়। শিশু-কিশোররা এসব পাঠ করে মনে প্রফুল্লতা বোধ করে। নিজেকে সমাজ সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে। মানুষ জীবন-জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণায় অনুপ্রাণিত হয়। টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত গঠনমূলক অনুষ্ঠান ব্যক্তির চিন্তা, চরিত্র, আচরণসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। উদ্দীপকের তাহসিনের ক্ষেত্রেও এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সে পত্রিকা পড়ে ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে। এগুলো তার আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তার আচরণ সকলের কাছে প্রশংসনীয় আবার এর মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জন করছে।

তাই বলা যায়, তাহসিনের সামাজিকীকরণে উদ্দীপকের শেষাংশে নির্দেশিত গণমাধ্যম অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

মডেল টেস্ট- ০২

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	M	২	N	৩	L	৪	M	৫	K	৬	M	৭	N	৮	K	৯	M	১০	N	১১	M	১২	L	১৩	K	১৪	K	১৫	L
	১৬	L	১৭	N	১৮	L	১৯	L	২০	L	২১	M	২২	N	২৩	N	২৪	K	২৫	L	২৬	K	২৭	L	২৮	K	২৯	L	৩০	N

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে যে কমান্ড গঠন করে তাই 'যৌথ কমান্ড'।

খ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষিত হলে এর প্রতিবাদস্বরূপ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। কিন্তু ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১লা মার্চ তারিখে স্থগিত ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলায় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রতিবাদ করতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' এলাকার মহান নেতার ভাষণটি আমার পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে নির্দেশ করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসন, বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙালির সাথে প্রতারণা ও বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি তুলে ধরা হয়। বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ করে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, 'ক' এলাকা কর্তৃক শোষণ ও বৈষম্যের শিকার হয় 'খ' এলাকার জনগণ। এই বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে 'খ' এলাকার একজন মহান নেতা তার দীর্ঘদিনের আন্দোলনের সফলতাকে কাজে লাগান। তিনি জনগণকে একত্রিত করে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার প্রেরণা হিসেবে একটি ভাষণ দেন। 'খ' এলাকার উক্ত ভাষণটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের অনুরূপ। তার প্রদত্ত ভাষণ দ্বারাই বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হয় এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাদুর স্পর্শে বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করার এই ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ২০১৭ সালে ইউনেস্কো এই ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে বর্ণিত কার্যক্রম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সরকারকে (মুজিবনগর সরকার) ইঙ্গিত করে।

মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালে ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'খ' এলাকার মহান নেতা 'ক' এলাকার শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এক প্রেরণাদায়ী ভাষণের মাধ্যমে জনগণকে স্বাধীনতা লাভে উদ্বুদ্ধ করে। শাসকগোষ্ঠী ক্ষুব্ধ হয়ে উক্ত নেতাকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তাঁর কিছু বিজ্ঞ সহকর্মী তাঁকে প্রধান রেখেই নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে ঐক্যবদ্ধভাবে উক্ত মহান নেতার ভাষণ তথা 'খ' এলাকার স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপ দেন। উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' এলাকার নেতার সহকর্মীদের সাংগঠনিক কার্যক্রম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করা হয়। মুজিবনগর সরকার বিভিন্ন কমিটি ও পরিষদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় সঠিক নেতৃত্ব দান করে। এই সরকারের নেতৃত্বেই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পায়। সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত কার্যক্রম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সরকারকেই তথা মুজিবনগর সরকারকে ইঙ্গিত করে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৩টি উজ্জ্বল বলয় শনিকে বেষ্টন করে আছে।

খ চাঁদ ও সূর্যের মিলিত আকর্ষণের ফলে সৃষ্ট জোয়ারকে ভরা কটাল বলে। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একই পাশে অবস্থান করে এবং পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর একপাশে চাঁদ ও অপর পাশে সূর্য অবস্থান করে। ফলে এই দুই তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য সমসূত্রে অবস্থান করে এবং উভয়ের মিলিত আকর্ষণে যে প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি হয় তাকে তেজ কটাল বা ভরা কটাল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় জনাব মতিউর রহমান প্রথমে মঙ্গল গ্রহ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মঙ্গল গ্রহের আয়তন ১৪৪,৭৯৮,৫০০ বর্গ কি. মি.। সূর্যকে পরিক্রমণ করতে মঙ্গল গ্রহের সময় লাগে ৬৮৭ দিন এবং নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট।

উদ্দীপকে বর্ণিত তথ্য মঙ্গল গ্রহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীর পরেই মঙ্গালের স্থান। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ২২.৮ কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে ৭.৮ কোটি কিলোমিটার। মঙ্গাল গ্রহের ব্যাস ৬,৭৭৯ কিলোমিটার এবং ওজন পৃথিবীর প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। তাই বলা যায়, জনাব মতিউর রহমান প্রথমে মঙ্গাল গ্রহের বৈশিষ্ট্যগত দিকটি আলোচনা করেছিলেন।

ঘ জনাব মতিউর রহমানের আলোচ্য দুটি গ্রহের মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ পৃথিবী মানুষের বসবাসের জন্য উপযোগী।

সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা ৮টি। গ্রহগুলোর নিজস্ব আলো ও তাপ নেই। ৮টি গ্রহের মধ্যে শুধু পৃথিবী মানুষের বসবাসের জন্য উপযোগী। পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার এবং উপরিভাগের তাপমাত্রা ১৩.৯০° সেলসিয়াস। এ গ্রহে প্রয়োজনীয় পানি রয়েছে। এ কারণে অন্যান্য গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র পৃথিবীই জীবজন্তু ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য আদর্শ গ্রহ।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম গ্রহ তথা মঙ্গাল গ্রহে জীবনধারণ ও বিকাশ অসম্ভব। কারণ সেখানে জীবনধারণের নিয়ামক অক্সিজেন নেই। এর বায়ুমন্ডলে শতকরা ৩ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২ ভাগ আরগন গ্যাস আছে। পানির পরিমাণ খুবই কম। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গাল অনেক ঠান্ডা, গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের অনেক নিচে। এ কারণে মঙ্গাল গ্রহ জীবনধারণের জন্য উপযোগী নয়।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, আলোচ্য পৃথিবী ও মঙ্গাল গ্রহ দুটির মধ্যে পৃথিবী মানুষের বসবাসের উপযোগী।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মঙ্গাল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ একত্রে পুঞ্জীভূত হয়ে পরিক্রমণ করছে সেগুলোকে একত্রে গ্রহাণুপুঞ্জ বলে।

খ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা হলা সবচেয়ে কম খরচে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় এবং এটি পরিবেশবান্ধব।

বর্তমান বিশ্বে তেল, গ্যাস বা পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহারের মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তার উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। সেই তুলনায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ অনেক কম। বর্তমানে বাংলাদেশ চট্টগ্রামের কাপ্তাই কর্ণফুলি নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

গ মাইশা ও মাহিরের ঘটনাটি বাংলাদেশের গ্রীষ্মঋতুকে নির্দেশ করে।

মার্চ হতে মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল। এটি দেশের উষ্ণতম ঋতু। এ ঋতুতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সে. এবং সর্বনিম্ন ২১ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ সময়ে সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে দেশের দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বেশি থাকে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ দেখা যায়, মাইশা ও মাহির এক বিকেলে নদীর পাড়ে বেড়াতে গিয়ে সেখানে প্রচণ্ড গরম অনুভব করে এবং ঘেমে যায়। এরপরই আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে যায় এবং শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এই অবস্থাটি এদেশের গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখি ঝড়কে ইঙ্গিত করেছে। উদ্দীপকের মাইশা ও মাহিরের ঘটনাটি এদেশের গ্রীষ্মঋতুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে সূর্য উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তি রেখার নিকটবর্তী হওয়ায় বায়ুর চাপের পরিবর্তন হয় এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। একই সময়ে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক হতে শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এতে ঝড়ের উদ্ভব হয়। এ ঝড়কে কালবৈশাখি বলে। উদ্দীপকে এ ঘটনাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে লিমা যে পরিস্থিতিতে পড়েছে তা ভূমিকম্প এবং তার সিঁড়ির দিকে যাওয়ার চেস্টা যথোপযুক্ত ছিল না।

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক আলোড়নের ফলে ভূমিকম্প হয়। কোনোরকম পূর্ব সংকেত ছাড়াই এ দুর্যোগ সংঘটিত হয় বলে তা পুরোপুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। তাই ভূমিকম্প চলাকালীন কিছু বিষয় মানতে হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ লিমার অবস্থানরত ভবনটি কাঁপছে এবং আসবাবপত্রগুলো নড়াচড়া করছে। এটা ভূমিকম্পের লক্ষণ। তখন সে দরজা খুলে বের হয়ে যাওয়ার চেস্টা করে। এটা কোনোভাবেই করা উচিত নয়। কারণ ভূমিকম্প হয় অল্পসময়ের জন্য। এর মধ্যে কোনোভাবেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামা সম্ভব নয়। উপরন্তু ওপরের অংশ ভেঙে চাপা পড়ার সম্ভাবনা থাকে; বরং ঘরে কোনো শক্ত টেবিল থাকলে সেখানে বা খাটের নিচে থাকা উচিত। অথবা ঘরের কোণে বা বিল্ডিংয়ের কলামের গোড়ায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। এতে করে তার ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।

ভূমিকম্পের সময় নিজেকে স্থির ও শান্ত রাখতে হয়। কেউ যদি একতলা দালানে অবস্থান করে তবে তার ঘরের বাইরে যাওয়া উচিত। এছাড়া ঘরের বাইরে থাকলে ঘরে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বহুতল ভবনের ভেতরে থাকাকালে ভূমিকম্প হলে টেবিল বা খাটের নিচে থাকতে হবে এবং কাচের জানালা থেকে দূরে থাকা উচিত। উঁচু দালান, ছাদ, জানালা দিয়ে লাফ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তাই বলা যায়, লিমার গৃহীত পদক্ষেপ সঠিক ছিল না।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্র সম্পর্কিত আব্রাহাম লিংকনের সংজ্ঞাটি হলো– গণতন্ত্র হলো, "জনগণের, জনগণের জন্য ও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা।"

খ ইলেক্টোরাল কলেজ চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করে নির্বাচনি কাজ সম্পন্ন করে।

ইলেক্টোরাল কলেজ একটি পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা, যা মধ্যবর্তী নির্বাচনি সংস্থা গঠন করে। পরোক্ষ নির্বাচন বলতে ঐ নির্বাচন পদ্ধতিকে বোঝায় যেখানে ভোটার ভোট দিয়ে সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচন করে একটি মধ্যবর্তী নির্বাচনি সংস্থা গঠন করে; যা ইলেক্টোরাল কলেজ নামে পরিচিত। এ সংস্থা চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করে থাকে।

গ জনাব রহমত সাহেব জেলা প্রশাসনে জেলা প্রশাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত থেকে উদ্দীপকে আলোচ্য কাজগুলো পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর তৃতীয় স্তরে রয়েছে জেলা প্রশাসন। এ স্তরে মূল দায়িত্বে থাকেন জেলা প্রশাসক। তাকে ঘিরেই জেলার সমগ্র শাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হয়। তিনি প্রধান কালেক্টর হিসেবে জেলার ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য কর ধার্য ও আদায় করেন। তিনি জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন ও সামাজিক বিভিন্ন অনাচার বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি জেলার শিক্ষা বিষয়ক সকল কর্মসূচির তত্ত্বাবধান ও তদারকি করেন এবং বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তিনি জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তদারকি, পরিচালনা, সমন্বয় করেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রহমত সাহেব সরকারি সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করেন। তিনি তার এলাকার ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য কর ধার্য ও আদায় করেন। এছাড়া তিনি কিছু বিচারিক কাজও সম্পন্ন করেন। রহমত সাহেবের কার্যাবলি উপরে বর্ণিত জেলা প্রশাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব রহমত সাহেব জেলা প্রশাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত থেকে বর্ণিত কাজগুলো করে থাকেন।

ঘ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের আরো বহুবিধ কাজ করতে হয় বিধায় করিম সাহেবের কাজগুলো তার প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট নয়।

১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের ৩ জন নির্বাচিত মহিলা সদস্যসহ মোট ১৩ জন নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের কাজ দুই ভাগে বিভক্ত, যেমন– প্রধান ও ঐচ্ছিক।

উদ্দীপকের করিম সাহেব যে প্রতিষ্ঠানের সদস্য তা আরো ১২ জন জনপ্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। করিম সাহেবের কার্যক্রমে কিছু প্রধান কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, অন্য কাজগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়নি। প্রধান কাজের অংশ হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনকল্যাণমূলক কাজ ও সেবা, স্থানীয় অর্থনৈতক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করে। এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, গরিব ও দুস্থব্যক্তিদের সাহায্য সহায়তা করা, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তদারকি, পাঠাগার স্থাপন, উদ্যান ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা, গণসংযোগ পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণকার্য সম্পাদন, সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ইউনিয়ন পরিষদের ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান ও ঐচ্ছিক কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় থাকা একান্ত আবশ্যক। তাই করিম সাহেবের কাজগুলো তার প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট নয়, এর বাইরেও তাকে অনেক কাজ করতে হয়।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সকল ভোটারকে একত্রিতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

খ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য নির্বাচনি আচরণবিধি আমাদের মানা উচিত।

নির্বাচন চলাকালীন সময়ে জনগণের আচরণের ওপর যে বিধি-নিষেধ আরোপিত হয় তাই নির্বাচনি আচরণবিধি। নির্বাচনি আচরণবিধি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের সভা ও মিছিলে কোনো রকম বাধা দেওয়া যাবে না। প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের ওপর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না। আচরণবিধি ভঙ্গ করলে সুষ্ঠু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়। তাই নির্বাচনি আচরণবিধি অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান অবশ্যই সবাইকে মানা উচিত।

গ উদ্দীপকে জনাব সাদেক যে দ্বীপে বসবাস করেন সেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বিদ্যমান।

যে শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকগণ প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় তাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলে। প্রাচীন গ্রিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর ধার্য, বিচারকার্য পরিচালনাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণ করত।

উদ্দীপকের জনাব সাদেক যে দ্বীপে বসবাস করেন সেখানেও দেখা যায়, প্রাচীন গ্রিসের ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের মতো দ্বীপটির অধিবাসীরা একসঙ্গে বসে দ্বীপটির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে ও সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ দ্বীপটির সকল নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে দ্বীপের শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। সুতরাং বলা যায়, জনাব সাদেক যে দ্বীপে বসবাস করেন সেখানে প্রত্যক্ষ ধরনের গণতন্ত্র বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের খোকনের কমিটির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের রাজনৈতিক দলের ধারণাটির মিল রয়েছে।

রাজনৈতিক দল বলতে একটি সংগঠিত নাগরিক সমষ্টিকে বোঝায়, যারা দলীয় আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে বৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। সংগঠন, কর্মসূচি প্রদান ও ক্ষমতা অর্জন রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক দল ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করা যায় না। শক্তিশালী ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রধান শর্ত।

উদ্দীপকে খোকন তার বন্ধুদের নিয়ে যে কমিটি গঠন করেছে সেটিও তাদের নিজস্ব নীতি প্রচার করে জনগণের সম্মতি নিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায়। সুতরাং বলা যায় যে, খোকনের কমিটির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের রাজনৈতিক দল ধারণাটির সাথে মিল রয়েছে। রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ হচ্ছে নির্বাচনে জয়লাভের পর সরকার গঠন করা। সাধারণত নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তারাই সরকার গঠন করে থাকে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজনৈতিক দল তার দলীয় নীতিমালা ও কর্মসূচির ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে। নাগরিকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যে রাজনৈতিক দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারা সরকার গঠন করে নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে। আর যে দল বা দলসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না তারা বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল পার্লামেন্টে বিতর্ক, সরকারের নীতির সমালোচনা, মুলতবি প্রস্তাব উপস্থাপন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে সংসদকে কার্যকর রাখে। সংসদের বাইরেও বক্তব্য, বিবৃতি ও সমালোচনার মাধ্যমে বিরোধী দল সরকারকে আইনের শাসন অনুশীলনে সহায়তা করে। এছাড়া বিরোধী দল জনগণের সামনে সরকারের পাশাপাশি বিকল্প কর্মসূচি তুলে ধরে। তাই গঠনমূলক সমালোচনা এবং কার্যকর ভূমিকা রাখা বিরোধী দলের অন্যতম দায়িত্ব।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম। রাজনৈতিক দল জনগণের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশাকে চিহ্নিত করে সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে 'জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)' সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে।

খ জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় অবদান রেখে চলেছে। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রায় ১১,০০০ এর বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাফল্য সারাবিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। তাই বলা যায়, জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত পল্লবের বাবা যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা বলেছেন সেটি হলো জাতিসংঘ। আর জাতিসংঘ নামক এ সংগঠনটির রয়েছে এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।

জাতিসংঘ পাঁচটি প্রধান অঙ্গ এবং একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে গঠিত। ৫টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী মোট ১৫টি রাষ্ট্র নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত হয়। ৫টি স্থায়ী রাষ্ট্র হচ্ছে– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন।

উদ্দীপকের দশম শ্রেণির ছাত্র পল্লব তার বাবার কাছে বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে কোনো সংগঠন আছে কি না জানতে চাইলে তার বাবা জাতিসংঘের কথা বলেন। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে পৃথিবীজুড়ে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। গত শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪–১৯১৮) এবং ৪০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯–৪৫) সংঘটিত হয়। মূলত জাতিগত দ্বন্দ্ব নিরসনে মধ্যস্থতাকারী শান্তিকামী জনতা যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় চুপ করে থাকেনি। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'লীগ অব নেশনস' সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু 'লীগ অব নেশনস' এর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্বশান্তি বিধানে তা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত ও আহত, গৃহহারা, পঙ্গুত্ব বরণ করে। প্রতিটি দেশ হারায় তাদের কর্মক্ষম যুব সম্প্রদায়কে। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ব বিবেককে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আর একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধনে' জাতিসংঘ নামক প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদটি 'সিডও সনদ' নামে পরিচিত। সিডও সনদটি ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর এটি কার্যকর হয়। বাংলাদেশসহ মোট ১৩২টি দেশ বর্তমানে এ সনদটি সমর্থন করেছে।

সিডও সনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি নারী অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল, যা বিভিন্ন সময়ে নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গ্রহণকৃত বিভিন্ন ইস্যুকে সমন্বিত করে। নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সনদটি তৈরি। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পদ্ধতিতে এ অধিকারগুলো ম্যান্ডেটভুক্ত করায় সমর্থনকারী দেশগুলো এ সনদ মেনে চলতে বাধ্য। এ সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার বলবৎ থাকলেও বৈষম্য রয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করার মাধ্যমেই তা করা হয়ে থাকে। এ সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে।

সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে। এর প্রথম ১৬টি ধারা নারীর প্রতি কত প্রকার বৈষম্য আছে তা বিশ্লেষণ করে। পরের ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৫ নভেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ। জাতিসংঘ ৮ মার্চকে 'বিশ্ব নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, নারীর উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ জন্মলগ্ন থেকে অনেক কাজ করেছে এবং নারীদের অবস্থানকে অনেক উন্নত করেছে।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ প্রতিটি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য সম্পদের সুষম বণ্টনের প্রয়োজন হয়। সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বণ্টনব্যবস্থা ধনী-দরিদ্রের দূরত্ব হ্রাস করে। সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়। একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠন তখনই সম্ভব যখন সম্পদের সুষম বণ্টন হয়। তাই সম্পদের সুষম বণ্টন প্রয়োজন।

গ 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসহ সব সম্পদ থাকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায়। এক্ষেত্রে সম্পদের ওপর ব্যক্তিমালিকানা অনুপস্থিত থাকে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই উৎপাদনের চারটি উপাদানকে সমন্বিত করে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদন কাজের নির্দেশনা দেয় ও তা পরিচালনা করে। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারই দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। কোনো দ্রব্য কী পরিমাণে, কখন ও কোন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হবে এবং এই দ্রব্য কাদের কাছে সরবরাহ করা হবে এ সবই সরকার নির্ধারণ করে। এখানে ভোক্তার নিজ ইচ্ছামতো দ্রব্যসামগ্রী ভোগের কোনো সুযোগ থাকে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আইরিনের বসবাসরত 'ক' দেশে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা ও চাহিদা মেটানো হয়। এটি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই শ্রমিকের মজুরি দেয় এবং উৎপাদনের সকল ব্যয় নির্বাহ করে। এখানে শ্রমিককে মজুরি দেওয়ার মূলনীতি হলো 'প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।' এর ফলে মোট জাতীয় উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়। তাই বলা যায়, 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত 'খ' দেশে বিদ্যমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা করলে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সর্বাধিক মুনাফা অর্জন এর প্রধান লক্ষ্য। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসহ সম্পদের ওপর প্রধানত বেসরকারি তথা ব্যক্তিমালিকানা থাকে। কিন্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ওপর সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের মালিকানা বিরাজ করে। ধনতন্ত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী ও ভোক্তা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। তারা কার্যত নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন বা ভোগ করতে পারে। পক্ষান্তরে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় শুধু বেসরকারি মালিকানাধীন সম্পদের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা বিরাজ করে।

ধনতন্ত্রে সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। কিন্তু মিশ্র ব্যবস্থায় সরকারি খাতে একটা বড় বা গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকে। বেসরকারি খাতে মুনাফা অর্জন মূল লক্ষ্য হলেও সরকারি খাতগুলো মূলত জনকল্যাণে কাজ করে। তবে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি খাতের প্রাধান্য থাকায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাতগুলোতেও অনেক ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনের তাগিদ থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের অসম বণ্টন বিরাজমান। অন্যদিকে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকারি খাতের সহাবস্থান থাকায় কিছুক্ষেত্রে সম্পদের সুষম বণ্টন দেখা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের 'খ' দেশে বিদ্যমান ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের প্রচলিত মিশ্র অর্থব্যবস্থার তুলনা করলে কিছু ভিন্নতা দেখা গেলেও কিছুক্ষেত্রে মিল রয়েছে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হারই হলো প্রবৃদ্ধির হার।

খ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে দারিদ্র্য দূর করে।

মাথাপিছু আয় মানুষের জীবনযাত্রার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। উচ্চ মাথাপিছু আয় উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করে। অর্থাৎ, একটি দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় যত বেশি হবে, দেশটির মানুষের জীবনযাত্রার মান তত উন্নত হবে। তাই মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।

গ দৃশ্যপট-১ এ উল্লিখিত 'A' দেশের অভ্যন্তরে ও ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বসবাসকারী এ দেশের নাগরিকদের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হলো উদ্দীপকের 'A' দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে এবং ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বসবাসকারী সব নাগরিক কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হলো মোট জাতীয় উৎপাদন। মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থানরত দেশি জনগণের আয় যোগ করা হয় এবং দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় বিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে যদি 'X' দিয়ে আমরা বিদেশে অবস্থানরত দেশি জনগণের আয় বোঝাই এবং 'M' দিয়ে দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় বোঝাই তাহলে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) = মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) + (X – M)

∴ উদ্দীপকের দৃশ্যপট-১ এ 'A' দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)

$= GDP + (X - M)$

$= \{২৪,০০০ + (৪,০০০ - ১,৫০০)\}$ কোটি টাকা

= ২৬,৫০০ কোটি টাকা।

সুতরাং, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে 'A' দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) হলো ২৬,৫০০ কোটি টাকা।

ঘ উদ্দীপকের দৃশ্যপট-২ এ নির্দেশিত 'B' দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তনের ধরন থেকে দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা আশাব্যঞ্জক বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-২ এ দেখা যায়, 'B' দেশটিতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে লোকসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ এবং তাদের মোট আয় ছিল ২০ কোটি ডলার। সুতরাং, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয়–

$$= \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

$$= \frac{২০,০০,০০,০০০}{২,০০,০০০} = ১,০০০ \text{ ডলার।}$$

আবার, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশটির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২.০২ লক্ষ এবং উৎপাদিত মোট দ্রব্যাদির অর্থমূল্য গিয়ে দাঁড়ায় ২২ কোটি ডলারে।

সুতরাং, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয়

$$= \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

$$= \frac{২২,০০,০০,০০০}{২,০২,০০০} = ১০৮৯.১ \text{ ডলার।}$$

সুতরাং B দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০৮৯.১ ডলার। অর্থাৎ দেশটির মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটেছে। কেননা, মাথাপিছু আয় ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে। উচ্চ মাথাপিছু আয় উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করে। তাই বলা যায়, জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটায় 'B' দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা আশাব্যঞ্জক।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমি ভোগ দখলের জন্য সরকারকে প্রদত্ত খাজনাকে ভূমি রাজস্ব বলে।

খ বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতটি হলো শিক্ষা।

একটি শিক্ষিত সমাজ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়টি বিবেচনা করে শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছে। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ, মাদরাসার জন্য অনুদান, উপবৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিস্তারের নতুন নতুন কার্যক্রমে যথেষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে।

গ সামির যে প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয় সেটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাংক হলো জনসাধারণের অর্থ গচ্ছিত রাখার এবং ঋণ গ্রহীতাদের বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ প্রদান করার প্রতিষ্ঠান। আর বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো সে ধরনের ব্যাংক যা বাণিজ্যিক লাভের উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তার মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের সামিরের ঋণ নেয়া প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিফলন স্পষ্ট। উদ্দীপকে দেখা যায়, সামির শহরে ব্যবসার জন্য বেশ বড় পরিমাণ ঋণ নিয়ে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি চালু করে। এভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বড় ঋণ প্রদান করে থাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ। কেননা বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজই হলো ঋণ প্রদান করা। এ ধরনের ব্যাংকসমূহ জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহীত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ গচ্ছিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রধানত স্বল্পমেয়াদি ঋণদান করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, সামিরকে ঋণ প্রদান করা প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তৌহিদের ঋণ নেয়া প্রতিষ্ঠানটির অর্থাৎ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম।

একজন কর্মক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক মানুষ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে উৎপাদন বা আয় অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকাকে স্বকর্মসংস্থান বলে। আর স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অন্যতম।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, শিক্ষিত যুবক তৌহিদ চাকরি না পেয়ে নিজে কিছু করবে ভেবে বাবার সম্পত্তি স্থানীয় একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে বন্ধক রেখে ঋণ নেয় এবং মাছের চাষ শুরু করে। তাই বলা যায়, তৌহিদের ঋণ নেয়া প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। কেননা এ ব্যাংকটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত রাখার বিনিময়ে কৃষি সংক্রান্ত খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই ব্যাংকের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ব্যাংকটি কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির

জন্য কৃষকদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। হালের বলদ, বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, পানি সেচের জন্য শক্তিচালিত পাম্প, গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি কাজের জন্য কৃষি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে কৃষিকার্য ছাড়াও হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, মৎস্য উৎপাদন, গুটি পোকার চাষ, ফলের চাষ, ফুলের চাষ ও কুটির শিল্পের জন্যও এই ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তৌহিদের ঋণ নেয়া প্রতিষ্ঠানটির তথা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ যে বিশেষ সমাজব্যবস্থার মধ্যে বাস করে তাই হলো সামাজিক পরিবেশ।

খ মানুষের মানসিকতা ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে গ্রামে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে।

দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, চাচাতো ভাই-বোন, মা-বাবা মিলে যৌথ পরিবার গড়ে ওঠে। এ ধরনের পরিবার স্থায়ী হওয়ার জন্য একে অপরের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা, সহানুভূতি ইত্যাদির প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে সমাজ পরিবর্তনের কারণে মানুষের মন থেকে এসব অনুভূতি লোপ পাচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন কারণে মানুষ শহরমুখী হচ্ছে এবং একক পরিবার গড়ে তুলছে। আর এসব কারণে গ্রামে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে।

গ উদ্দীপকের রাদ ও অর্ণবের কথায় সামাজিকীকরণের যে মাধ্যমের চিত্র ফুটে উঠেছে তা হলো সমাজজীবন।

সমাজজীবন সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বা উপাদান। মানুষ যে সমাজে বসবাস করে সে সমাজের আচার-আচরণের সমষ্টি হলো সমাজজীবন। আর রাদ ও অর্ণবের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিই ক্রিয়াশীল। রাদ ও অর্ণব স্বাধীনতা দিবসে আয়োজিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে সমাজ জীবনের একটি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে এবং তারা নিজেদেরকে বিকশিত করছে। কারণ মানুষ সমাজের নানা কর্ম ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এসব কর্ম ও অনুষ্ঠানসংশ্লিষ্ট আচরণের সাথে মানুষ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে মানুষ অন্যের আচরণ অনুকরণ করে কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করে। জন্মদিন, বিয়ে, ঈদ, পূজা, বড়দিন প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমাজ জীবনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমাজজীবনের এসব অনুষ্ঠান ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে। অতএব বলা যায়, রাদ ও অর্ণবের ক্ষেত্রে সমাজ জীবনের প্রভাব লক্ষণীয়।

ঘ রাদ ও অর্ণবের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া কিছু ক্ষেত্রে একই, আবার কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী।

গ্রাম ও শহর উভয় সমাজেই ব্যক্তির সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া কতকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ আবার কতগুলো বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। রাদ ও অর্ণবের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে রাদ শহরের ছেলে, অর্ণব গ্রামের ছেলে। রাদ ও অর্ণবসহ সব শিশুই পারিবারিক জীবনের যাবতীয় কার্যের প্রভাবে প্রভাবিত। পরিবারের মাধ্যমেই তারা নীতিবোধ, নাগরিক চেতনা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি প্রত্যয়গুলো শেখে। এটি গ্রাম ও শহর উভয়ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। গ্রাম ও শহর উভয় সমাজেই প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, সহপাঠী দল রয়েছে। এদের সাথে আন্তরিকতার সম্পর্ক, সহযোগিতা, সহানুভূতি এগুলো শহরের তুলনায় গ্রামে অনেক বেশি। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর বিদ্যালয় পরিবেশসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব শহর ও গ্রামে এক নয়। শহরের স্কুলগুলোতে খেলার মাঠ, পুকুর, বাগান ইত্যাদি নেই বললেই চলে। তবে গ্রামের স্কুলগুলোতে সহশিক্ষা কার্যক্রম উপাদানের ঘাটতি কম।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, গ্রাম ও শহরে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক আদর্শ, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। যেগুলো ভিন্ন মাত্রায় ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে। রাদ ও অর্ণবের ক্ষেত্রেও একটি প্রযোজ্য।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে পুরুষ বা নারী কর্তৃক যেকোনো বয়সের নারীর প্রতি যেসব সহিংস আচরণ করা হয় তাই নারীর প্রতি সহিংসতা।

খ বাংলাদেশে এইডস ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার বেশকিছু কারণ রয়েছে।

প্রতিদিন দেশের অসংখ্য লোক বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করছে। এইডস রোগের ভাইরাস বহন করে আনছে। দেশে পেশাদার রক্তদাতার সংখ্যা বাড়ছে। এদের বেশিরভাগ মাদকাসক্ত এবং এরা একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। আমাদের দেশের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মোটর শ্রমিক ও রিকশাচালক প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে লিপ্ত রয়েছে। এসব কারণে বাংলাদেশের জন্য এইডস মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে রহমান সাহেবের দেখা প্রথম ঘটনাটি সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে ইঙ্গিত করে।

সমাজস্বীকৃত রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত আচার-আচরণের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি তথা সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রহমান সাহেবের দেখা ঘটনায় এ বিষয়টি অনুপস্থিত।

উদ্দীপকের রহমান সাহেব স্কুল ড্রেস পরা কিছু ছাত্রকে রাস্তার মোড়ে ধূমপান করতে দেখেন। এক পর্যায়ে তারা মারামারি শুরু করলে রহমান সাহেব তাদের থামানোর চেষ্টা করল কিন্তু তারা থামল না। আর এ অবস্থাটিই হলো মূল্যবোধের অবক্ষয়। বস্তুত যেসব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, সংকল্প, মানুষের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর সমষ্টিই মূল্যবোধ। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, অতিথিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা, বন্ধু বা সহপাঠীর প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ। এসব মূল্যবোধের অবনতিই হলো সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের বর্ণনায় কারখানার মালিক প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করেছেন বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুদের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শিশু অধিকার বিষয়ে এদেশে আইনও প্রচলিত রয়েছে। কারখানার মালিকের কাজে এ আইন না মানার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের কারখানার মালিক ১০/১২ বছরের দুজন শিশুকে দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করলে জবাবে সে কাজের সার্টিফিকেট আছে বলে জানায়। অথচ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৪ বছরের কম বয়সি কোনো শিশুকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না। শিশুর বাবা-মা কিংবা অভিভাবক শিশুকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য কারও সাথে কোনো প্রকার চুক্তি করতে পারবে না। কিশোর শ্রমিক নিয়োগ করতে হলে রেজিস্টার্ড ডাক্তারের কাছ থেকে মালিকের খরচে ফিটনেস সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু কারখানার মালিক এ আইন না মেনে শিশুদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারখানার মালিক শিশুশ্রম সম্পর্কিত প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন করেছেন।

মডেল টেস্ট- ০৩

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	L	২	M	৩	K	৪	K	৫	M	৬	L	৭	K	৮	N	৯	N	১০	M	১১	K	১২	M	১৩	N	১৪	L	১৫	K
	১৬	N	১৭	M	১৮	L	১৯	N	২০	K	২১	M	২২	L	২৩	N	২৪	L	২৫	N	২৬	M	২৭	M	২৮	K	২৯	M	৩০	L

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট ৪টি দল নিয়ে গঠিত হয়।

খ স্বীয় ক্ষমতা ও সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়।

আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি ব্যবস্থা চালু করেন। এই ব্যবস্থায় ৮০ হাজার নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। ১৯৬৫ সালে ৮০ হাজার মেম্বারের ভোটে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এরা সবাই ছিল তার অনুগত। এভাবেই মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করে আইয়ুব খান তার সামরিক শাসনকে দীর্ঘায়িত করার চেস্টা করেন।

গ মি. রাকিবের এই পরিণতির জন্য চাকরি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানা বৈষম্যই দায়ী।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পূর্ব বাংলা সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে অগ্রসর ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন শোষণ ও বঞ্চনার ফলে পূর্ব পাকিস্তান দ্রুত পিছিয়ে যেতে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. রাকিব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে তার কর্মজীবন শেষ করেছেন। সকল ধরনের চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চাৎগামী হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে মি. রাকিবের মতো অনেক বাঙালি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চপদে চাকরি পেতে ব্যর্থ হন।

ঘ হ্যাঁ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে ঐশিরা আজ বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্য বঞ্চনা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। বাঙালিরাও তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তান সরকারের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ও '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ন্যায় প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ঐশির বাবা একজন সচিব। দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত তাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং তাদের এলাকার অনেকেই আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। মূলত ১৯৫২ ও ১৯৬৯ এর আন্দোলনের ফলে ঐশিরা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। কেননা বাঙালিরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মাতৃভাষা বাংলার দাবি আদায়ে সফল হয়। পাকস্তানি শাসকগোষ্ঠী শুধু ভাষার প্রশ্নে বৈষম্য করেই থেমে থাকেনি। তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রতিরক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রেই বাঙালির প্রতি বৈষম্য করে। এসব বৈষম্যবঞ্চনার প্রতিবাদে বাঙালি জাতি ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানসহ নানা প্রতিরোধ আন্দোলন করে। এসব আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা পাকিস্তানের শাসন শোষণের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়। এরই ফলশ্রুতিতে আজ স্বাধীন বাংলাদেশে ঐশির মতো নাগরিকেরা গর্বিত নাগরিক হিসেবে বসবাস করার সুযোগ পেয়েছে।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার যে বীজ বপন করে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে তা পূর্ণরূপে পরিস্ফুঠিত হয়। ফলে বাঙালি স্বাধীন মার্তৃকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

খ ৭ই মার্চের ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান করায় এ ভাষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। বাঙালির অধিকার ক্ষুণ্ন করে তারা দমন, পীড়ন চালাতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানান। আর এ আহ্বানে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলার মানুষ দেশকে স্বাধীন করে। তাই ৭ই মার্চের ভাষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান-এর কার্যক্রম বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কার্যক্রমের সাথে মিল রয়েছে।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন চারিদিকে ছিল স্বজন হারানোর বেদনা, কান্না, হাহাকার আর ধ্বংসযজ্ঞ। অসংখ্য রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, কলকারখানা, নৌবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ছিল বিধ্বস্ত। রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল অর্থশূন্য। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকের লতিবপুর গ্রাম টর্নেডোর আঘাতে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। উক্ত এলাকার চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সফল হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ত্রিশ লাখ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, গ্রামগঞ্জের লাখ লাখ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনর্নিমাণ, সর্বোপরি সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণ ও আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

ঘ যুদ্ধবিধ্বস্ত যে কোনো দেশের উন্নয়নে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো নেতার প্রয়োজন।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং সরকার প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সামগ্রিক পুনর্গঠন, ভারতে অবস্থানরত এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, সংবিধান প্রণয়ন, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান, ভারতের মিত্রবাহিনীর সদস্যদের ফেরত পাঠানো, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ইত্যাদি তাঁর শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য অর্জন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিয়েই যাত্রা শুরু হয় বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের মতো কঠিন দায়িত্ব পালন ছাড়াও বঙ্গাবন্ধু তার শাসন আমলে দেশ পরিচালনার জন্য নতুন সংবিধান তৈরির জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করেন। এছাড়া পরিত্যক্ত কারখানা জাতীয়করণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, রিলিফ প্রদান ও রেশনিং প্রথা চালু এবং বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ১৯৭৩ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাই বলা যায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত যে কোনো দেশের উন্নয়নে বঙ্গাবন্ধুর মতো নেতার প্রয়োজন।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোকে স্থানীয়ভাবে টিলা বলে।

খ বাংলাদেশের কিছু স্থানে জনবসতি কম থাকার পিছনে রয়েছে অনুন্নত যাতায়াতব্যবস্থা, বনভূমি ও ভূ-প্রকৃতিগত কারণ।

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান অঞ্চলে জীবিকা সংস্থান কষ্টসাধ্য হওয়ার এসব অঞ্চলে জনবসতি কম। এসব অঞ্চলের অনুন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, জটিল জীবনযাত্রার মান, জনসংখ্যার কম ঘনত্বের কারণ। এছাড়া পাহাড়-পর্বত, বন প্রভৃতির কারণে জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়ে। এসব কারণে বাংলাদেশের কিছু স্থানে জনবসতির ঘনত্ব কম।

গ উদ্দীপকের জহির ও তার বাবার কথোপকথনে ভূমিকম্প নামক প্রাকৃতিক দুর্যোগটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক কারণে যে দুর্যোগটির সৃষ্টি হয় তাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে। ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভূপৃষ্ঠে সংঘটিত আকস্মিক ও অস্থায়ী কম্পনকেই ভূমিকম্প বলে।

উদ্দীপকের জহির ও তার বাবার কথোপকথনে মাটির অভ্যন্তরীণ গঠন ও কাঠামো এবং মনুষ্যসৃষ্ট কিছু কারণে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটার চিত্র পাওয়া যায়। ভূমিরূপ ও ভূঅভ্যন্তরীণ কাঠামোগত কারণে বাংলাদেশে ভূআলোড়নজনিত শক্তি কার্যকর এবং এর ফলে এখানে ভূমিকম্প হয়। ভূতাত্ত্বিকের মতে, ভূত্বকের গভীরে সঞ্চিত তাপের কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরে পরিচালন স্রোতের সৃষ্টি হয়। ফলে সেখানে প্রবল শক্তি উৎপন্ন হয়ে ভূত্বকের বিভিন্ন অংশে আলোড়ন ও পরিবর্তন হয়। এ কারণে অনেক সময় মৃদু থেকে প্রচণ্ড ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের ফলে কখনো কখনো বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ভেঙে পড়ে। বিভিন্ন মাত্রায় হতাহতের ঘটনা এবং প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে নদীর গতিপথসহ ভূপৃষ্ঠে পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে। তাই বলা যায়, তাদের কথোপকথন ভূমিকম্প নামক প্রাকৃতিক দুর্যোগকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে জহিরের বাবার শোষোক্ত আক্ষেপে জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়টি ফুটে উঠেছে, যার প্রভাব আমাদের জীবন-জীবিকার ওপর ব্যাপক।

বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। জলবায়ুজনিত ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, নদনদী ভাঙন মানুষের জীবন-জীবিকার পরিবর্তন আনে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জহিরের বাবা ছয় ঋতুর পরিবর্তে তিন ঋতুর আবির্ভাবের কথা বলেন। বাংলাদেশ মূলত ছয় ঋতুর দেশ হলেও বর্তমানে বর্ষা, গ্রীষ্ম ও শীত- এ তিনটি ঋতুই দেখা যায়। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে ঋতু বৈচিত্র্যের এ পরিবর্তন বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার গতিময়তা নষ্ট করছে। তাই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এতে বিভিন্ন রকমের ফসল ও প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মায়। আবার শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এদেশে স্বল্পপরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। ফলে ধান, গম, তামাক ও বিভিন্ন রকমের শাকসবজি উৎপাদন করা যায়। জলবায়ুর কারণে সৃষ্ট বন্যায় পানিবাহিত পলিমাটি কৃষিক্ষেত্রগুলোর উর্বরতা বাড়ায়। এতে ফসল অনেক ভালো হয়। মৌসুমি বায়ুর এসব ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষণীয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গড় তাপমাত্রা দেশের সর্বত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাত, ভারী বর্ষণের ফলে ভূমিধস, বন্যা ও পাহাড় ধসের মতো ভয়াবহ দুর্যোগও হচ্ছে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, জলবায়ুর পরিবর্তন আমাদের জীবন-জীবিকার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাফ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬ কি.মি.।

খ নদী বা সাগরের পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে জলবিদ্যুৎ বলা হয়।

নদী ও জলপ্রপাতের পানির বেগ ব্যবহার করে টার্বাইন যন্ত্রের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এটি নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদ। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে এ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। সবচাইতে কম খরচে এ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের কথা বলা হয়েছে।

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম উপাদান হলো খনিজ সম্পদ। গ্যাস, কয়লা, তেল, চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের সুমন পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষাসফরে গিয়ে দেখতে পায় চুনাপাথর ও কয়লাসহ নানারকম পদার্থ আহরণ করছে। সুমন আরও জানতে পারে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে এ ধরনের সম্পদ রয়েছে যা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুমনের দেখা উদ্দীপকে নির্দেশিত পদার্থগুলো মূলত খনিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি জেলাসমূহের মাটির নিচে গ্যাস, কয়লা, তেল, চুনাপাথরসহ নানা ধরনের মূল্যবান খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব সম্পদ আহরণ করে দেশের গ্যাসের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের তলদেশেও গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে আরও অনেক ধরনের প্রাণিজ ও খনিজ পদার্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে খনিজ সম্পদের কথা বলা হয়েছে।

ঘ উক্ত সম্পদের অর্থাৎ খনিজ সম্পদের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে যথার্থ উন্নয়ন করতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং উন্নত জীবনমান সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

উদ্দীপকে বিভিন্ন খনিজ সম্পদের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে খনিজ সম্পদের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। খনিজ সম্পদকে ব্যবহার করে দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে। দেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আসছে খনিজ সম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে।

বর্তমানে দেশে যেসব শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠেছে তাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা বাড়ছে। ফলে যথার্থ গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে সহজেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া খনিজ সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ ও গবেষণার মাধ্যমে এ সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগালে দেশের অর্থনৈতিক ভিত আরও শক্তিশালী হবে।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, খনিজ সম্পদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় পর্যায়ের তথা বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা শাসনব্যবস্থাকে স্থানীয় প্রশাসন বলে।

খ আধুনিক রাষ্ট্রে আইনের প্রধান উৎস হলো আইনসভা।

সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই আইনসভা বা আইন পরিষদ রয়েছে। এ আইনসভায় দেশের জনগণের স্বার্থকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের কাজটি সম্পন্ন করেন।

গ সাদী সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। গড়ে ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এটি একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য ও তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান হলেন চেয়ারম্যান। এর কার্যকাল ৫ বছর। ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, জনকল্যাণমূলক কাজ, বিরোধ নিষ্পত্তি, অপরাধ দমনসহ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের সাদী সাহেব একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। তিনি ১২ জন পুরুষ ও মহিলা সদস্য নিয়ে তার সংস্থার সকল কাজ পরিচালনা করেন। তিনি এলাকার বিরোধ নিষ্পত্তি, অপরাধ ও চোরাচালান দমনসহ এলাকার উন্নয়নে কাজ করেন। এতে বোঝা যায়, সাদী সাহেবের সংস্থাটির গঠন ও কার্যাবলি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সাদী সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ঘ জনাব রাহী জেলা পরিষদের প্রতিনিধি এবং জেলা পরিষদে অনেক জনহিতকর কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো জেলা পরিষদ। একজন চেয়ারম্যান, পনেরো জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের পাঁচজন মহিলা সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত। জেলা পরিষদের সদস্যগণ পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এর মেয়াদকাল ৫ বছর।

উদ্দীপকের জনাব রাহী জেলা পরিষদের প্রধান। কেননা তিনি পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন এবং ২০ জন সদস্য নিয়ে তিনি তার কার্যক্রম পরিচালনা করেন, যা জেলা পরিষদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। জেলা পরিষদ স্বীয় এলাকায় জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে। যেমন– এলাকায় রাস্তাঘাট, ব্রিজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। শিক্ষার উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরি প্রদান ও অন্যান্য সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করে জেলা পরিষদ। দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণকর আশ্রয়সদন, এতিমখানা, বিধবাসদন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। জুয়া, মাদকদ্রব্য, কিশোর অপরাধসহ অন্যান্য অপরাধ দমনে ব্যবস্থা গ্রহণ করে ও এলাকার বিরোধ নিষ্পত্তি করে। আবার এটি কৃষকদের উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ, আদর্শ খামার স্থাপন, সেচের পানি সরবরাহসহ বিভিন্ন সহায়তা দেয়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলের শিল্পসমূহের কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি, এলাকাবাসীর ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতি সাধন প্রভৃতি কাজও জেলা পরিষদ সম্পন্ন করে।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, জনাব রাহীর প্রতিষ্ঠান জেলা পরিষদ জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ করে থাকে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের, জনগণের জন্য ও জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা।"

খ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার কতকগুলো নীতিমালাই হলো নির্বাচনি আচরণবিধি।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সঠিক আচরণের জন্য নির্বাচন কমিশন যে আচরণবিধি প্রণয়ন করেছেন তাই নির্বাচনি আচরণবিধি। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পূর্বশর্ত হলো নির্বাচনি আচরণবিধি মেনে চলা। আচরণবিধি ভঙ্গ করলে সুষ্ঠু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়।

গ মি. রহিম যে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেটি হলো রাজনৈতিক দল, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যার ভূমিকা অপরিসীম।

রাজনৈতিক দল বলতে এমন একটি সংগঠিত নাগরিক সমষ্টিকে বোঝায়, যারা দলীয় আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে বৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। আধুনিক রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

উদ্দীপকে মি. রহিমের সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রদান করে জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অর্জন। বস্তুত, সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল যা উদ্দীপকে উল্লিখিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে থাকে। জনগণের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশাকে চিহ্নিত করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে সামনে রেখে তাদের এই কর্মসূচি নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলায় ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক দল জনগণের মতামত ও অভিযোগ সরকারের নিকট উত্থাপনের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে, যা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে কার্যকর করে তোলে। তাই বলা যায়, মি. রহিম যে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেটি রাজনৈতিক দল এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এটির অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে।

ঘ "উক্ত সংগঠনের অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের সাথে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।"– উক্তিটির সাথে আমি একমত।

শক্তিশালী ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অস্থিত্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের প্রধান শর্ত। জনগণের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ-

দুর্দশাকে চিহ্নিত করে সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এ সকল কর্মসূচির ফলে জনগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়। উদ্দীপকে মি. রহিমের সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রদান করে জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অর্জন। সুতরাং তার সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল, যা উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করার উদ্দেশ্য দ্বারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। শক্তিশালী ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের দ্বারা জনগণের এই ক্ষমতায়ন তথা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাফল্য অর্জিত হয়। এছাড়াও দলের নীতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে জানানোর জন্য রাজনৈতিক দল সভাসমিতি, টকশো আয়োজন এবং পত্র-পত্রিকায় মতামত ব্যক্ত করে তাদের নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে এবং জনসমর্থন সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যম উক্ত জনসমর্থনকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে, যা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনের সঙ্গে সম্পর্ক বহন করে। উদ্দীপকে মি. রহিমের সংগঠন তথা রাজনৈতিক দলটিও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যিনি উৎপাদনের অন্যতম উপাদান ভূমি, মূলধন ও শ্রমকে সমন্বিত করে পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন তাকে উদ্যোক্তা বলে।

খ বাতাসের অপ্রাচুর্য, বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা নেই বলে অর্থনীতিতে বাতাসকে সম্পদ বলা হয় না।

অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে সেসব বস্তুকে বোঝায় যার উপযোগ, অপ্রাচুর্য, বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা আছে। এক্ষেত্রে উপযোগ হলো অভাব পূরণের ক্ষমতা। অপ্রাচুর্য বলতে বোঝায় চাহিদার তুলনায় যোগানের সীমাবদ্ধতা। বাহ্যিকতা হলো বস্তুর দৃশ্যমানতা। আর হস্তান্তরযোগ্যতা হলো একজনের নিকট থেকে বস্তুটি আরেকজনের পাওয়ার সম্ভাব্যতা। বাতাসের উপযোগ আছে। কিন্তু বাতাস প্রকৃতিতে অফুরন্ত। অর্থাৎ অপ্রাচুর্য নেই। আবার এটি দৃশ্যমান নয় এবং এটি হস্তান্তরও করা যায় না। এজন্য অর্থনীতিতে বাতাস সম্পদ নয়।

গ 'C' দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ে মিশ্র অর্থব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ ব্যবস্থায় যেমন দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত, তেমনি সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। অর্থনীতির কোনো কোনো খাত বা খাতের অংশবিশেষ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

উদ্দীপকের 'C' দেশের অর্থনীতিতে মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। কেননা 'C' দেশে দেখা যায়, দেশটিতে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণের ওপর কোনো প্রকার বিধি-নিষেধ নেই, কিন্তু এ দেশে নির্ধারিত সম্পদের অতিরিক্ত কেউ মজুদ করতে পারে না। অর্থাৎ দেশটিতে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীনতা আছে যা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। আবার এদেশে ব্যক্তিগতভাবে সম্পদ মজুদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, 'C' দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, 'A' দেশের তুলনায় 'B' দেশে শ্রমিকের মজুরির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

বর্তমান বিশ্বে যেসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন, বণ্টন, ক্রয়-বিক্রয়, ভোগ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে। এক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ নেই। আবার, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই। এসব ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ থাকে। কেননা, এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসহ সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শামিম 'A' দেশে ইচ্ছামতো দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। এতে সরকারি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু শামিম 'B' দেশে পাঁচ হাজার মিটার কাপড় কিনতে চাইলে বিক্রেতা জানায় তাদের দেশে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া। এতে বোঝায় যায়, 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক এবং 'B' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ অধিক হয়। কেননা এ ব্যবস্থায় মালিকপক্ষ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। ফলে উৎপাদন ব্যয় কম রাখতে তারা শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি থেকে কম মজুরি দিয়ে থাকে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রই শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করে। এতে ধনতন্ত্রের মতো পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিক শোষণের সুযোগ থাকে না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রত্যেককে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ও মজুরি দেয়।

তাই বলা যায়, 'A' দেশের তুলনায় 'B' দেশে অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকের মজুরির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাথাপিছু আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের নাগরিকদের গড় আয়।

খ বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশের সাথে আমদানি-রপ্তানি তথা বাণিজ্যিক সম্পর্ককে বোঝায়।

দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর আদান-প্রদানকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বের কোনো একটি দেশের সাথে অন্য এক বা একাধিক দেশের দ্রব্যসামগ্রীর যে লেনদেন হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। যেমন– বাংলাদেশ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে এবং সেসব দেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। সুতরাং রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের সমন্বয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য গঠিত।

গ উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটি হলো উন্নত দেশ। যেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে সেসব দেশকে উন্নত দেশ বলে। উন্নত দেশের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উঁচু। ২০১৮ সালে বিশ্বের প্রধান কয়েকটি উন্নত দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ৩৮৪২৮ মার্কিন ডলার থেকে ৭৫৫০৪ মার্কিন ডলারের মধ্যে। তবে ১২২৭৬ ডলার বা তার বেশি মাথাপিছু আয়ের দেশগুলোকে উন্নত দেশ বলা হয়। উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি শিল্পনির্ভর। শিল্পই তাদের জাতীয় আয়ের প্রধান খাত। তবে এসব দেশের কৃষিব্যবস্থাও উন্নত। এই দেশগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নুহা উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য যে দেশে গিয়েছে সে দেশের মাথাপিছু আয় ৮৫,০০০ ডলার। দেশটির অর্থনীতি শিল্পনির্ভর এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যাধুনিক। এর কৃষিব্যবস্থাও উন্নত। দেশটির বৈশিষ্ট্য উপরে বর্ণিত উন্নত দেশের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের দেশটি একটি উন্নত দেশ।

ঘ বাংলাদেশকে উক্ত দেশ অর্থাৎ উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছতে হলে এদেশের উন্নয়নের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো দূর করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এজন্য বাংলাদেশে যেকোনো জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য একটি নীতিগত ভিত্তি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা চালু করতে হবে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্প খাতের প্রসার, ভারি বা মৌলিক শিল্প স্থাপন এবং এ খাতের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোকে শক্তিশালী করতে হবে।

উদ্দীপকে নুহা একটি উচ্চ আয়ের দেশে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য যায়। সে দেশের ন্যায় বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে উপরিউক্ত পদক্ষেপের পাশাপাশি সকল প্রকার আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এছাড়াও সঞ্চয়, মূলধন গঠন, উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ও বণ্টন প্রক্রিয়া, অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা ও উন্নত মানবসম্পদ তৈরির মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করার মাধ্যমেই বাংলাদেশ উদ্দীপকের দেশের মতো উন্নত দেশে পরিণত হবে বলে আমি আশাবাদী।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত সরকারের নীতি ও পদ্ধতিকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের তাৎপর্যপূর্ণ খাতটি হলো শিক্ষা।

একটি শিক্ষিত সমাজ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়টি বিবেচনা করে শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ, মাদরাসার জন্য অনুদান, উপবৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিস্তারের নতুন নতুন কার্যক্রমে যথেষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে।

গ দৃশ্যপট-১ এর রহিমা বেগম গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন।

গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের পল্লির ভূমিহীন নারী ও পুরুষদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক হিসেবেও এটি পরিচিত। এটি বাংলাদেশের দরিদ্র পুরুষ ও নারীদের বিনা জামানতে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে। গ্রামীণ মহাজনদের শোষণ থেকে গরিব মানুষকে রক্ষা করার মহান ব্রত নিয়েই এ ব্যাংকের অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-১ এ দেখা যায়, রহিমা বেগম হাঁস-মুরগি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে দশ হাজার টাকা ঋণ নেন। উক্ত বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা গ্রামীণ ব্যাংককেই নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা, বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকই একমাত্র বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান, যা গ্রামীণ ভূমিহীন নারী-পুরুষদের বিনা জামানতে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাংকটি ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামের বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। তাই বলা যায়, রহিমা বেগম গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন।

ঘ দৃশ্যপট-২ এ উল্লিখিত করটি অর্থাৎ বাণিজ্য শুল্ক বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস– এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

বাংলাদেশ সরকার জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসন পরিচালনা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ আয় করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ক. কর রাজস্ব ও খ. কর-বহির্ভূত রাজস্ব। কর রাজস্বের অন্যতম খাত হলো বাণিজ্য শুল্ক। দেশের আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে বাণিজ্য শুল্ক বলা হয়। বাংলাদেশ সরকার এ খাত থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ আয় করে বলে একে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস বলে অভিহিত করা হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-২ এর শিমুলের বাবা বিদেশি গাড়ির আমদানিকারক। এছাড়াও তিনি দু'টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক। সেগুলোতে উৎপাদিত দ্রব্য তিনি বিদেশে রপ্তানি করেন। তিনি নিয়মিত কর দেন। তিনি মূলত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করার জন্য শুল্ক দেন। এ ধরনের শুল্ককেই বাণিজ্য শুল্ক বলা হয়। বাংলাদেশ সরকার তার মোট আয়ের সিংহভাগ অংশই এ খাত থেকে আয় করে।

সুতরাং বলা যায়, বাণিজ্য শুল্ক বাংলাদেশ সরকারের মোট রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই উদ্দীপকের করটি বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস বলা যায়।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিশুর সামাজিকীকরণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যম বিদ্যালয়।

খ পরিবারে শিশুর ধর্ম শিক্ষার কাজ সম্পন্ন হওয়ায় পরিবারই ছিল একসময়ে শিশুদের ধর্ম শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র।

শিশুর ধর্ম শিক্ষায় পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। ছোটবেলা থেকে প্রতিটি শিশুই তার পরিবার থেকে ধর্মশিক্ষা লাভ করে। এক সময়ে যখন আমাদের গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবার বেশি ছিল তখন শিশুরা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করত পিতা-মাতা, দাদা-দাদি ও অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে। অর্থাৎ তখন পরিবারই ছিল শিশুর ধর্ম শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র।

গ উদ্দীপকের প্লাবিতা তার পরিবারে বাবা, মা ও ছোট ভাই অহনের সাথে ঢাকায় বসবাস করে, যা একক পরিবার বা অণু পরিবারকে নির্দেশ করে।

স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তানসন্ততি নিয়ে গঠিত পরিবারকে অণু পরিবার বা একক পরিবার বলা হয়। এ পরিবার দুই পুরুষে আবদ্ধ। দুই পুরুষ হলো পিতা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানসন্ততি। শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও আধুনিকায়নের ফলে একক পরিবার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলেও এ ধরনের পরিবার দেখা যায়। তবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের পরিবারই সবচেয়ে বেশি।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তানসন্ততি নিয়ে যে পরিবার গড়ে ওঠে তাকে অণু পরিবার বা একক পরিবার বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবারটি অণু পরিবার বা একক পরিবার। 'একক পরিবার কেবল শহরেই দেখা যায়, গ্রামে নয়'– এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই।

পিতামাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, সন্তানসন্ততিসহ একত্রে বসবাস করলে যে পরিবার গড়ে ওঠে তাকে যৌথ পরিবার বলে। একসময় ছিল যখন আমাদের গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবারের সংখ্যাই অধিক ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়ন, নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দরিদ্রতা, ভোগবাদী মানসিকতাসহ নানা কারণে যৌথ পরিবার ভেঙে তদস্থলে একক পরিবার গড়ে উঠছে।

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচির বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণ করে যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবারে রূপ নিচ্ছে। একসময় শুধু শহরে একক পরিবার বা অণু পরিবার দেখা যেত, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে এখন গ্রামেও একক পরিবারের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে শহরের পাশাপাশি গ্রামেও এখন একক পরিবার বিদ্যমান। তাই আলোচ্য উক্তিটি যথার্থ নয়।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিশোর বয়সিদের দ্বারা সংঘটিত সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধ ও নিয়মনীতি বিরোধী কাজই হচ্ছে কিশোর অপরাধ।

খ শিশুশ্রমের প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা।

অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণেই শিশুশ্রম বেড়ে চলেছে। দরিদ্র পরিবারে ভরণপোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগানো বাবা-মার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই তাদেরকে স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকেরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় পিতা বা মাতা পরিবারের বাড়তি রোজগারের আশায় শিশুকে যেকোনো পেশায় নিয়োজিত করেন। অন্যদিকে শিশুদেরকে অল্প পারিশ্রমিকে দীর্ঘক্ষণ কাজে খাটানো যায় বলে নিয়োগকর্তারাও শিশুদের কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহী হয়। আর এভাবেই আর্থিক দুরবস্থা শিশুশ্রমকে বাড়িয়ে তুলছে।

গ উদ্দীপকের রাহাত যে সামাজিক সমস্যায় আক্রান্ত সেটি হলো মরণব্যাধি এইডস।

এইডস-এর পূর্ণরূপ হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)। এটি এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত একটি মরণব্যাধি। এইচআইভি কয়েকটি নির্দিষ্ট উপায়ে মানবদেহে প্রবেশ করে থাকে। এই ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তির একমাসের বেশি সময় ধরে শুকনো কাশি হতে পারে এবং শরীরের ওজন দ্রুত কমে যায়।

উদ্দীপকের রাহাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সে দু'বছর থেকে বন্ধুদের সাথে একই সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। একমাস ধরে সে জ্বর জ্বর অনুভব করছে, সঙ্গে শুকনো কাশি। তার ওজনও দ্রুত কমে যাচ্ছে। রাহাত তার বন্ধুদের সাথে একই সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক সেবনের ফলে এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, যার লক্ষণ তার শরীরে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত লক্ষণগুলোর ভিত্তিতে বলা যায়, রাহাত এইডস রোগে আক্রান্ত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত লোকটির কর্মকাণ্ড সামাজিক সমস্যা দুর্নীতিকে নির্দেশ করছে। আর দুর্নীতি প্রতিরোধে ডাক্তার সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপ যথার্থ ছিল।

ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক নীতি বহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী কাজই দুর্নীতি। যেমন– ঘুষ, বল প্রয়োগ, স্বজনপ্রীতি, প্রভাব খাটানো, প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি দুর্নীতি। আবার অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে অবহেলাও দুর্নীতি।

উদ্দীপকের হাসপাতালের লোকটি টাকার বিনিময়ে ডাক্তারের খোঁজ দেওয়ার বিষয়টি ঘুষকে নির্দেশ করে, যা মূলত একটি জনস্বার্থ বিরোধী কাজ এবং দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে উল্লিখিত দুর্নীতি প্রতিরোধে ডাক্তার সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপ যথার্থ ছিল। কেননা সমাজজীবনে দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব প্রকট এবং সুদূরপ্রসারী। দুর্নীতি মানুষের ন্যায্য অধিকারকে হরণ করে। সমাজের যোগ্য ব্যক্তিগণ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দুর্নীতিপ্রবণ সমাজে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়। আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে দুর্নীতি জাতীয় জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধ করা আবশ্যক। কঠোর আইনের প্রয়োগ, দুর্নীতিবাজদের আইনের কাছে সোপর্দ করা, গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যায়।

উদ্দীপকের ডাক্তার তার হাসপাতালের দুর্নীতিবাজ লোকটিকে পুলিশে সোপর্দ করে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন। কেননা এর মধ্য দিয়ে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দুর্নীতি বন্ধ হবে এবং অন্যান্য দুর্নীতিবাজরাও সাজার ভয়ে দুর্নীতি করা থেকে বিরত থাকবে। ফলে দুর্নীতি নির্মূল হবে। অতএব বলা যায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে ডাক্তার সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপ যথার্থ ছিল।